কিছু কথা...

চৈতন্য অন্তর্ধানের ওপর লেখা আমার উপন্যাস 'সেথায় চরণ পড়ে তোমার' লেখার পরও তাঁর অন্তর্ধান নিয়ে আমার অনুসন্ধান চলতে থাকে। এই সময় 'খুঁজি তোমার চরণচিহ্ন' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু হয়। লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার সময় বহু ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে, তাই বাধ্য হয়েই এই লেখা মাঝপথে বন্ধ করেছিলাম। কিন্তু আমার পাঠকরা এই ধারাবাহিক লেখাটিকে গ্রন্থাকারে চেয়েছিলেন এবং আমারও মনে হয়েছিল, এসব তথ্য সকলের সামনে আসুক। কারণ বর্তমান সময়ে 'মহাপ্রভুর অন্তর্ধান' নিয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে, যাতে সেই একই বর্ণনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বলে আমার ধারণা। আবার এর মধ্যে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করাও ঠিক নয়, দু-একজন বিশিষ্ট লেখক যথেষ্ট ঘাম ঝরিয়ে এই রহস্যের সমাধানের চেষ্টা করেছেন। শুধুমাত্র বইয়ের আকার বৃদ্ধির জন্য অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা কিংবা একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে আমি শুধুমাত্র মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কারণগুলিকেই তুলে ধরেছি। আমার মনে হয় এতে বইটি পড়ার সময় পাঠকরা ক্লান্ত হবেন না। আমি আমার সাধনাকে গ্রন্থের রূপ দান করার জন্য 'শব্দ প্রকাশন'-কে শুভেচ্ছা জানাই, ভাই বিকাশকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা জানাই।

কোনো ধোঁয়াশা আর নয়, গ্রন্থের শেষে আশা করি সঠিক সিদ্ধান্ত তুলে ধরতে পেরেছি। অনেক তো হল, পাঁচশো বছর অতিক্রান্ত, তাই এখন আর কোনো ভয় কিংবা বিপত্তিকে মাথায় না রেখে আগামী প্রজন্মকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া আমাদের কর্তব্য। প্রসঙ্গত, মহাপ্রভুর অন্তর্ধান বিষয়ক এটিই আমার শেষ গ্রন্থ। তবে সব শেষে একটা কথাই বলব আমার সিদ্ধান্তই শেষ কথা হতে পারে না, এর পরও অনেক কিছু বলার থাকে। পাঁচশো বছর অতিক্রান্ত, প্রমাণ এবং সাক্ষী সবই নিশ্চিহ্ন। শুধুমাত্র অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। আগামী প্রজন্মকে আমি এই পথে অগ্রসর হওয়ার আমন্ত্রণ জানাই। পাঁচশো বছর পরও এত ধোঁয়াশা এবং বিপদ কেন? এটাই তো রহস্য।

দেবশ্রী চক্রবর্তী

পর্বান্তর

খুঁজি তোমার চরণ চিহ্ন ১১
গেরুয়া বসনধারী সেই রহস্যময় বাবাজি ১৭
যাঁরা তাঁকে ঈশ্বরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ২৭
'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-র রিপোর্ট এবং গুপ্তহত্যা ৩৪
ভ্রান্ত ধারণা ৪০
রাধাতন্ত্র এবং রঘুরাজপুর রহস্য ৪৬
দুটি চক্র একটি বৃত্ত ৫৭
কে এই জগন্নাথ? ৬৫
চক্রব্যূহ ৭২
অন্তর্ধানের পরও তাঁকে বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে ৭৮
জালালপুর গ্রামের সেই রহস্যময় মন্দির ৮৪
তিনি কি উড়িষ্যা ত্যাগ করতে পেরেছিলেন? ৯০
মাধবের 'বৈষ্ণব লীলামৃত' ও 'চৈতন্য বিলাস'—
তাঁর শেষ পরিণতি ৯৯
উৎকল থেকে বঙ্গদেশ ১১১
ব্রহ্ম পদার্থ ১২৯

খুঁজি তোমার চরণ চিহ্ন

এ এক অদ্ভুত খেলা যাকে কোনো যুক্তি কিংবা তর্ক দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। কিছু কিছু সম্পর্ক অনাদি-অনন্ত কাল ধরে এক চলমান স্রোতের মতো বইতে থাকে, যে স্রোতের মাঝে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কালের যাত্রাপথের সেই স্রোতের দুই কূলের থেকে কিছু ছায়ানর্তক যখন নদীগর্ভে নেমে এসে এক প্রবল ঘূর্ণাবর্ত তৈরি করে, তখনই সেইসব বিশেষ সম্পর্কের প্রকৃত পরিভাষা আমরা অনুভব করতে পারি।

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজন্ম এক রহস্যময় বাঁধনে আবদ্ধ, এর সূচনা যে কবে আজ আর তা মনে করতে পারি না। তবে আজ থেকে বহু বছর আগে ঘন কুয়াশায় আবৃত এক রাত্রির কথা মনে পড়ে যায়, নদীয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামে আমার কয়েকশো বছরের প্রাচীন মামাবাড়ির একতলার ঘর, দিদিমা তাঁর দেরাজ থেকে তাঁর নিজের হাতে তৈরি নকশিকাঁথা, লেপ এসব বার করছিলেন। আমি খাটের ওপর বসে এক মনে তাকিয়েছিলাম একটি ছবির দিকে। ঘরের এক কোণে টেবিলের ওপর হ্যারিকেন জ্বলছিল। যার হালকা আলোয় ঘরের মধ্যে এক রহস্যময় আলো-আঁধারি তৈরি করেছিল। সেই আলো-আঁধারির মধ্যে দিয়ে আমি তাকিয়েছিলাম ছবিটির দিকে। ছবিতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর দুই হাত তুলে এগিয়ে চলছিলেন সমুদ্রের দিকে।

শৈশব থেকেই আমার মধ্যে প্রশ্ন করার প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। দিদিমাকে প্রশ্ন করে বসলাম, "দিদিমা, উনি সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন কেন?"

দিদিমা উত্তরে বলেছিলেন, "খুকি, মহাপ্রভু সমুদ্রের নীল জলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করেছিলেন, তাই তো তিনি সেই জলের মধ্যে আত্মনিবেদন করেছিলেন।"

সেদিন সেই আলো-আঁধারির মধ্যে পাঁচশো বছর আগের এক মানুষের উপস্থিতি প্রথম গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম, মনে হয়েছিল ছবি থেকে বেরিয়ে এসে, আমার আশেপাশে তিনি বিরাজ করছেন।

মাঝে সময়ের গর্ভে অনেক জল বয়ে যায়, তারপর একদিন আমাদের বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকার মুখে শুনেছিলাম যে শ্রীচৈতন্য নাকি দেববিগ্রহে মিলিয়ে গেছেন। আমার সেই শিক্ষিকা অত্যন্ত ভক্তিসহকারে আমাদের জানিয়েছিলেন যে চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতার ছিলেন, তাই এরকম রহস্যময় ঘটনা কলিযুগেও সম্ভব হয়েছিল।

আজ স্বীকার করতে অসুবিধা নেই যে, সেদিন আমার সহজ-সরল মন সেই শিক্ষিকার কথাকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু কেন জানি না তাঁকে (শ্রীচৈতন্যকে) জানার তীব্র ইচ্ছা আমার মধ্যে কাজ করছিল। এইভাবে চলমান সময়ের স্রোতে বইতে বইতে ১৯৯৫ সালে খবরের কাগজের একটি প্রতিবেদন আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করে, সেই প্রতিবেদনে লেখা ছিল ১৯৯৫ সালের ১৭ এপ্রিল পুরীতে চৈতন্য-গবেষক জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের রহস্যময় মৃত্যু। দুজন মানুষের মৃত্যু অত্যন্ত রহস্যময়, যাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান পাঁচশো বছর। চৈতন্য এবং চৈতন্য-গবেষক দু-জনের মধ্যে 'চৈতন্য' শব্দটি আমার চেতনাকে কোথাও যেন নাড়িয়ে দিচ্ছিল। মাঝে আরও পাঁচটি বছর কেটে যায়, ২০০০ সালে আমার কলেজ জীবনের একদম সূচনালগ্নে খবরের কাগজে আর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, যার প্রতিটি শব্দ আমার দীর্ঘ বিশ্বাসের ইমারতকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। সেদিন শুধু আমি না, আমার মতো বহু মানুষের বিশ্বাসে আঘাত আসে। সেই প্রতিবেদনে লেখা ছিল পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সংস্কার কার্যের সময় গর্ভগৃহ থেকে একটি সাড়ে ছয় ফুটি উচ্চতার কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়, যা প্রায় পাঁচশো বছরের প্রাচীন বলে জানা গেছে।

এই লেখার সূচনালগ্নেই আমি উল্লেখ করেছি যে মহাপ্রভুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনাদি-অনন্ত কালের। তাঁর জন্ম নদীয়ায় এবং আমার মামারবাড়ি নদীয়ায়, সেই অর্থে দুজনের মধ্যে কোথাও এক গভীর নাড়ির টান রয়েছে। আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি নদীয়ায়। আমার শ্বশুরমশাইয়ের মুখে শুনেছি আমার স্বামীর জন্ম নাকি জগন্নাথের স্বপ্নদর্শনের পর হয়েছিল।

তিনি নাকি স্বপ্নে জানিয়েছিলেন যে স্বয়ং জগন্নাথ তাঁদের পুত্রসন্তান রূপে জন্ম নেবেন। এসব কথা শুনে অনেকেই বিদ্রূপ করবেন, কিন্তু ওঁর এই কথাগুলি আমার মনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আমার স্বামীর উচ্চতা এবং তাঁর উজ্জ্বল শারীরিক বর্ণ এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে মহাপ্রভুর আমি মিল খুঁজে পেতাম। শিক্ষিকার কথায় তিনি জগন্নাথের অংশ, আমার স্বামীর জন্মের পেছনে সেই জগন্নাথের স্বপ্নাদেশ, এইসব কিছু কোথাও মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। সময়ের চলমান স্রোতের ধারা এবার আমাকে পৌঁছে দেয় ২০১০ সালের মার্চ মাসে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে। আমি আমার স্বামী অমর্ত্যর হাত ধরে রত্ন-বেদিতে উপবিষ্ট তিন দেবতাকে প্রদক্ষিণ করছি। এই প্রদক্ষিণের সময় যখন রত্ন-বেদির পেছনে গিয়ে পৌঁছোই, তখন আমার এমন এক অনুভূতি হয় যা শব্দ দিয়ে বর্ণনা করা খুবই কঠিন। কারণ গর্ভগৃহের প্রদীপের আলো রত্ন-বেদির পেছনে গিয়ে পৌঁছোয় না। সেইদিকে অন্ধকারকে শুধুমাত্র মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। পাথরের পিচ্ছিল মেঝের ওপর দিয়ে যখন পা ফেলে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন কেন যেন মনের ভেতর গভীর অনুশোচনা হচ্ছিল, নিজের অজান্তেই দু-চোখ দিয়ে জল ঝরছিল। আমি চোখ বন্ধ করে স্বামীর হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। জগন্নাথদেবকে পূজা দেওয়ার পর আমাদের সদাশিব মুরলী পাণ্ডা গরুড় স্তম্ভের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, "মহাপ্রভু এখানে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন করতেন। ওঁকে তো মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না।"

এসব শুনে আমি ওঁকে বললাম, "কেন এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল তাঁর ওপর?"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সদাশিব মুরলী পাণ্ডা বলেছিলেন, "ওঁকে অনেকে পছন্দ করত না।"

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা, আমি ওঁর মুখমণ্ডলীতে এক গভীর লজ্জার ছাপ প্রত্যক্ষ করছিলাম। তিনি বেশ কিছুক্ষণ মন্দিরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন, "ওঁর মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না।"

আমি প্রথমেই বলেছি যে, আমার মধ্যে জানার ইচ্ছা অত্যন্ত তীব্র। আমি আবার প্রশ্ন করি, "তাহলে কি হত্যা করা হয়েছিল?"

সদাশিব মুরলী পাণ্ডা মন্দিরের দিকে অনেকক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থাকার পর বলেন, "মা, এসব কথা বরং থাক, কেউ শুনতে পেলে বিপদ হবে।"

সেদিন রাতে হোটেলের অন্ধকার ঘরে শুয়ে অনেক রকম প্রশ্ন মাথায়